Rajshahi University journal of arts & law Vol. 50 (2022) pp. 1-14
ISSN 2309-0898

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমরের দৃষ্টিভঙ্গি: একটি দার্শনিক অনুসন্ধান
[Badruddin Umar's View on Education System of Bangladesh: A Philosophical Inquiry]

মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন*

Abstract

Education is the way of awakening consciousness among the people. It changes the outlook and behaviour of human beings. Education boosts our inspiration to change the society as well. But traditional education system cannot do this because of the backwardness of philosophical thinking of the ruling class of our socity. They divide education system for dividing the people of our society for exploiting the majority of the people, though the ruling class is minority. According to Badruddin Umar, the philosophical foundation of prevalent education system is reactionary because it protects the interest of ruling class or bourgeois. If we want to bring equality in education system in the state, we need to do class struggle for establishing classless society. That is why we must connect the education movement with the movement of social change and we have to run both movements together.

মূল শব্দ: শিক্ষা, দর্শন, উপরিকাঠামো, শিক্ষাব্যবস্থা, শাসক শ্রেণি, শ্রেণিবৈষম্য, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র প্রভৃতি। (Education, Philosophy, Superstructure, Education System, Ruling Class, Class Discrimination, Capitalism, Imperialism, and Socialism)

১. ভূমিকা

শিক্ষা হলো চিত্তের জাগরণ বা বোধোদয়। শিক্ষা মানুষের চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতির পরিবর্তনের সাথে সাথে আচার-আচরণের পরিবর্তন ঘটায় এবং একটা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে বদলানোর পাশাপাশি তার মধ্যে সমাজকে বদলানোর প্রেরণা সঞ্চার করে। মানুষ সমাজে একটি সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্যে বাস করে। শিক্ষা এই সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করে। ইতিহাসে দেখা গেছে, কোনো সমাজে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন হলে, সেই শিক্ষা যারা অর্জন করতে পারে তাদের জীবনধারণ, জীবনযাপনের ঢং ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসে। সেকারণে একটি সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা উপরিকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। একটি রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা সরাসরি তার সমাজব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। আরসমাজের ভিত্তি (base) হলো তার 'উৎপাদন প্রণালি' (mode of production) যার ওপর নির্ভর করে শিক্ষাব্যবস্থা নামক উপরিকাঠামো (superstructure) গড়ে উঠে।

তাই কোনো সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি যদি পুঁজিবাদী হয় তাহলে তার শিক্ষাব্যবস্থাও হবে পুঁজিবাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থা। আবার কোনো সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি যদি সমাজতান্ত্রিক হয় তাহলে তার শিক্ষাব্যবস্থাও হবে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থা। সমাজের উৎপাদন প্রণালি রাষ্ট্রের চরিত্রও নির্ধারণ করে এবং রাষ্ট্র এর চরিত্র অনুযায়ী শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, প্রয়োজন মতো ব্যবহারও করে। কাজেই একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত দার্শনিক স্বরূপ উপলব্ধি করতে তার সঙ্গে জড়িত

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, E-mail: pmamun2012@gmail.com

রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণ জরুরি হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের প্রকৃতি কীভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে? বদরুদ্দীন উমরের মতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা কেন অগ্রহণযোগ্য? এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হবে আলোচ্য প্রবন্ধে।

২. উমরের শিক্ষাদর্শন প্রসঙ্গে প্রাথমিক কথন

বদরুদ্দীন উমর একজন প্রথাগত মার্কসবাদী চিন্তাবিদ। বাংলাদেশের প্রবীণ মার্কসবাদী চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের ইতিহাস, সমাজ, রাষ্ট্র, সামাজিক সংকট, শ্রেণিদ্বন্দ্ব, আন্দোলন, সংগ্রাম, গণ-অসন্তোষ, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ব্যাপকভাবে পড়াশুনা করেছেন, আবার লিখেছেনও প্রচুর। তাঁর বর্তমান বয়স নব্বই বছর। কাজেই তিনি এদেশের সমাজ বিবর্তন-পরিবর্তনের সত্তর বছরের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তিনি পেশায় ছিলেন শিক্ষক, আবার রাজনীতিতেও সক্রিয়। এসব বিষয় সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে বদরুদ্দীন উমরের শিক্ষাদর্শন বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার দাবি রাখে।

বদরুদ্দীন উমরের শিক্ষাদর্শনের বিষয়বস্তু বাংলাদেশের আধুনিক কালের শিক্ষাব্যবস্থা। তিনি এই শিক্ষাব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি উন্মোচন করেছেন, দার্শনিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। বঙ্গদেশে আধুনিক কালের শিক্ষাব্যবস্থা বলতে বুঝি সাম্রাজ্যবাদের বাহক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল তা কালে কালে নানা সংস্কার, সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান কালে বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার রূপ ধারণ করেছে।

বদরুদ্দীন উমর এ দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিমূলের দার্শনিক বিশ্লেষণ করেছেন, স্বরূপ উন্মোচন করেছেন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে। যেহেতু একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র একটি নিয়ামক শক্তি, সেহেতু বদরুদ্দীন উমর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্র কীভাবে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে নির্মাণ, পরিচালনা ও শ্রেণিস্বার্থে ব্যবহার করেছে তা বিশ্লেষণ করেছেন ইতিহাস বিজ্ঞানের আলোকে। তাঁর শিক্ষাদর্শনের দুটি দিক- নেতিবাচক ও ইতিবাচক। নেতিবাচক অংশে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। ইতিবাচক অংশে তিনি একটি প্রগতিশীল আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে উমরের শিক্ষাদর্শনের নঞর্থক বা নেতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৩. উমরের শিক্ষাদর্শনের নঞর্থক দিক

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি প্রবর্তিত শিক্ষাধারার বিবর্তনের ফসল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, যাকে আমরা বলছি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা। এখানে উমরের দৃষ্টিতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা কেন অসাড়, প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিমুখী সমাজ বিনির্মানের অন্তরায় তা উপস্থাপন করা হবে।

৩.১ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দর্শন সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে

উমরের মতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তিই প্রতিক্রিয়াশীল। কারণ এ শিক্ষাব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ধনিক শ্রেণির জন্য প্রবর্তন করা হয়েছিল। তা ধনিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বঙ্গ জয়ের প্রাক্কালে বঙ্গদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দিকে নজর দিলে দেখা যায় প্রাক-ব্রিটিশ সময়ে অভিজাত শ্রেণির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল মাদ্রাসা, শিক্ষার ভাষা ছিল ফারসি। কিন্তু সেখানে ধর্ম ছাড়াও নানা বিষয় শিক্ষাদান করা হতো। নবাবের আমর্তবর্গ, ব্যবসায়ী, রাজকর্মচারীসহ ধনিক শ্রেণির সন্তানরা এই শিক্ষা গ্রহণের অধিকারী ছিল। কৃষক ও

কারিগর শ্রেণির (কামার, কুমার, তাঁতি, তেলি ইত্যাদি) সন্তানরা তাদের পরিবারেই পেশাগত শিক্ষা গ্রহণ করত। ফলে বর্ণকর্ম বিভাজনের অচলায়তন অনড়ই ছিল। বাস্তবে দাঁড়াল এই যে, কৃষক ও কারিগর যারা সমাজের সিংহভাগ তারা রয়ে গেল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে।

আগেই বলা হয়েছে, এদেশে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা জয়ের পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সৃষ্টি করলো নতুন অভিজাত শ্রেণি-জমিদার। "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙলাদেশের আর্থিক জীবনে নতুনভাবে দুটি পরস্পর বিরোধী শ্রেণির সৃষ্টি করেছিল। একটি, বন্দোবস্তের দ্বারা উপকৃত জমিদার শ্রেণি ; অপরটি তার দ্বারা উৎপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক শ্রেণি।"[১] তারপর গজিয়ে উঠলো কোম্পানির অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। তারাও ক্রমে ক্রমে ধনিক শ্রেণিতে পরিণত হলো। কোম্পানি এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করলো তা এদেশের সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য নয়, তা একেবারে নিজের স্বার্থে, অনুগত মানুষ তৈরির স্বার্থে। এদেশের প্রশাসন পরিচালনা ও দখলদারিত্ব বজায় রাখার জন্য যত জনবল প্রয়োজন ছিল তার সব নিজ দেশ থেকে আনা সম্ভব ছিল না। ফলে নিচু ও মধ্যস্তরের কর্মচারী ও কেরানি সৃষ্টির জন্য শিক্ষা প্রবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছিল।

> ...ভারতবর্ষে ইংরেজ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় শুধু কেরানি সৃষ্টিরই প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিলো মূলতঃ এমন একটা শ্রেণি সৃষ্টি যারা পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে ভারতীয় জনগণ থেকে নিজেদেরকে তফাৎ করবে এবং সাংস্কৃতিক আধিমানসিক (Intellectual) ও জীবিকার দিক দিয়ে তৎকালীন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল থাকবে।[২]

কাজেই কেরানিকুল ছাড়াও একটা অনুগত শ্রেণি সৃষ্টি করাও ছিল ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য। তাছাড়া জমিদার ও ব্যবসায়ীসহ ইংরেজ অনুগত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সে ক্ষেত্রে ভাষা ছিল ব্যবধান। ফলে কোম্পানি এদেরকে তথাকথিত শিক্ষিত করে তোলা দায়িত্ব মনে করলো । মূলকথা "ঊনিশ শতক থেকে বাঙলাদেশে যারা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদি হয়ে পেশাগত জীবনযাপন শুরু করেছিল তারা অধিকাংশই ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তপুষ্ট পরিবারভুক্ত।"[৩] এতে প্রমাণ করে শিক্ষাটা ধনিক শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই শুধুমাত্র নতুন অভিজাত, আমলা ও ধনিক শ্রেণির লোকই অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা গ্রহণের অধিকারী হলো। বৃহত্তর কৃষক ও কারিগর শ্রেণি এই শিক্ষাব্যবস্থার ধারে কাছে ঘেষতে পারলো না। সবাই তো আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নন। এমন কিছু ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছে।

এই সময় ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী একটা উদ্ভট যুক্তি প্রচার করলো যে, কৃষকের ছেলে লেখাপড়া শিখলে রোদ-ঝড়-বৃষ্টিতে মাঠে কাজ করার ক্ষমতা হারাবে। এ সব যুক্তির মধ্য দিয়ে তারা নিম্নবিত্তদেরকে নিরুৎসাহিত করে উচ্চবিত্তদের মধ্য থেকে একটা উচ্চশিক্ষিত অনুগত শ্রেণি তৈরি করেছিল। "লর্ড মেকলে বলেছিলেন যে, তাঁদের শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো এমন এক শ্রেণির শিক্ষিত ব্যক্তি সৃষ্টি করা যারা রক্ত ব্যতীত আর সব দিক দিয়েই হবে পশ্চিমাদের মতো, বিশেষতঃ ইংরেজদের মতো।"[৪] উমর মনে করেন মেকলের এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। তাই এই শ্রেণির অধিকাংশই ঊনিশ ও বিশ শতকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্রিটিশদের সেবায় নিয়োজিত ছিল। ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসন আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন হলেও শিক্ষা কখনো ধনিক শ্রেণির হাত থেকে মুক্ত হয়নি।

তারপর ১৯৪৭ সালে সৃষ্টি হলো পাকিস্তান, বাংলা ভেঙ্গে দু'ভাগ হলো। এলো তথাকথিত স্বাধীনতা। দুর্ভাগ্য পূর্ব বাংলার। ইংরেজ গেল, ক্ষমতা দখল করলো পাঞ্জাবি সামরিক-বেসামরিক এলিট। পাকিস্তানের প্রায় সব সম্পদ কুক্ষিগত হলো দাদা, আদমজির মতো বাইশ পরিবারে হাতে। তারা পূর্ব বাংলার পাট

শিল্পসহ কিছু মিল, কলকারখানা গড়ে তুললো। উদ্ভব হলো ছোট্ট হলেও শ্রমিক শ্রেণি। পূর্ব বাংলা পরিণত হলো পূর্ব পাকিস্তান নামক উপনিবেশে। শাসক বদল হলো, শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন হলো না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঢাকার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে সরকারি অফিস করা হলো। রাষ্ট্রীয় বাজেটে পূর্ব বাংলার জন্য শিক্ষাখাতে বরাদ্দ যৎসামান্য। জেনারেল আইউব খান ১৯৫৯ সালে অধ্যাপক এস.এম. শরীফকে চেয়ারম্যান করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৬২ তে। "এখানে শিক্ষাকে একটি 'বিনিয়োগ' তথা লাভ-লোকসানের ব্যবসা হিসাবে দেখানো হয়। শরীফ কমিশন তার প্রতিবেদনে সরাসরি এই বাক্যটিই লিপিবদ্ধ করেন- শিক্ষা সস্তায় পাওয়া সম্ভব নয়।"[৫] কমিশন আরও উল্লেখ করে যে, "অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল ও নামমাত্র বেতনের মাধ্যমিক স্কুল স্থাপনের জন্য সরকারের উপর নির্ভর করাই জনসাধারণের রীতি। তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে অবৈতনিক শিক্ষার ধারণা বস্তুতঃ অবাস্তব কল্পনা মাত্র।"[৬] শরীফ কমিশনের উপরোক্ত বক্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিক্ষাকে ঐ কমিশন বাণিজ্যে পরিণত করতে চেয়েছে। শিক্ষা যদি বিনিয়োগ হয় তাহলে যার টাকা আছে সে-ই শিক্ষা পাবে কিন্তু যার টাকা নেই সে শিক্ষা পাবে না, হোক সে সন্তান যত মেধাবী। পাকিস্তান সরকার শরিফ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাডেট কলেজ ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। "ক্যাডেট কলেজগুলির প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে পূর্ব পাকিস্তানের বুকে বিত্তশালী এবং বিত্তহীন ব্যক্তিদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য দুই জাতীয় পরিকল্পনা কার্যকরী হতে চলেছে।"[৭] তাই বলে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সাধারণ গরিব মানুষদের জন্য উন্মুক্ত করা হলো তা কিন্তু নয়। এখানেও রীতিমত ছাত্র-বেতন ও অন্যান্য মাসুলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়।[৮] তার পরেও গ্রামে ভূমিব্যবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হলো না। কারণ গ্রামে গজিয়ে উঠলো জোতদার। তারাই সিংহভাগ ভূমির মালিক। পাটসহ কিছু কৃষি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে জোতদার শ্রেণির হাতে পয়সা এলো। বাস্তবে দাঁড়ালো এই যে, সামরিক বেসামরিক আমলা, বড় ব্যবসায়ী, ঠিকাদার ও জোতদারের সন্তানই শুধুমাত্র শিক্ষায়তনে প্রবেশের অধিকারী হলো অর্থের বিনিময়ে। পরিণতিতে, প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষি, ক্ষেতমজুর,শহরের শ্রমিক শ্রেণি, রিক্সাচালক, ঠেলাগাড়ীচালক, এদের সন্তানরা রয়ে গেল শিক্ষায়তনের প্রাচীরের বাইরে। যদিও ১৯৬২ সাল থেকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার দাবিতে লাগাতার সংগ্রাম করে তাতে তেমন কোনো ফল হয়নি। তবে ছাত্র আন্দোলনের চাপে শরীফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত করা হয়। রাষ্ট্রের মালিক ধনিক শ্রেণি। সুতরাং শিক্ষাও ধনিক শ্রেণির দখলে থাকবে সেটিই পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্র।

বাংলার ইতিহাস যতদূর জানা যায় তার মধ্যে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গর্বের ঘটনা। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ যুদ্ধে জয়ী হলো। বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম এমন একটি সরকার গঠিত হলো যার সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্ততা ছিল। নেতৃত্বে ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার পর অল্প সময়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ ও অবৈতনিক করা হলো। শিক্ষকদের জন্য সম্মানজনক বেতনের ব্যবস্থা করা হলো। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রগতিশীল দর্শনের আলোকে পুর্নগঠন করার জন্য বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। "... এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে আমাদের সুপারিশ এই যে, আমাদের শিক্ষা খাতে ব্যয় অবিলম্বে মোট জাতীয় আয়ের ৫% এ উন্নতি করা দরকার এবং এই ব্যয়ের পরিমাণ যত অল্প সময়ে সম্ভব ৭% করা জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।"[৯] এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এই কমিশন শিক্ষাখাতের সব ব্যয়ই সরকারকে বহন করতে সুপারিশ করেছে। কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের সুপারিশ বিবেচনা ও

বাস্তবায়নের আগেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হলো। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার মধ্য দিয়ে আবার শুরু হলো পাকিস্তানি আদলে কখনো সামরিক, কখনো আধা-সামরিক, কখনো ছদ্ম-সামরিক শাসন।

১৯৭৫ পরবর্তী সময় থেকে এখন পর্যন্ত লুটেরা অর্থনীতিই আধিপত্য করেছে। কমবেশি সব আমলেই লুটপাট বিদ্যমান। দেশের অর্থনীতি হয়েছে দুর্বল। এই প্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বব্যাংক এবং আই.এম.এফ-এর মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ঋণ প্রদান করলো। তার পরেও দেশের অর্থনীতির কোনো উন্নতি হলো না। দরিদ্র শ্রেণির মানুষের কপালে কিছু জুটলো না। প্রায় সব অর্থ লুটেরা শ্রেণি ভাগবাটোয়ারা করে নিল। এদিকে দেশে চলতে থাকলো অবাধ লুটপাট। ফলে ধনিক শ্রেণি দ্রুত স্ফীত হলো। এখন তো প্রতিটি থানায় কোটিপতির সংখ্যা অনেক। পরিণামে বাংলাদেশ আটকে গেল বিদেশি ঋণের জালে। উল্লেখিত পরিস্থিতির প্রতিফলন দেখা গেল সমাজে ও শিক্ষাব্যবস্থায়। "তিন চতুর্থাংশ মানুষ ১৯৮১-৮২ সালে পুষ্টিহীনতায় ভুগেছেন। ১৯৭৭-৭৯ সালে উচ্চ শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পায় ২১ ভাগ।"[১০] ফলে আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মানুষের সন্তানরা শিক্ষায়তনে প্রবেশের ক্ষমতা হারিয়েছে। এমন পরিস্থিতি আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি। সামরিক শাসক ও দেশি-বিদেশি লুটেরা শ্রেণি সম্মিলিতভাবে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এই প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ হাসান আজিজুল হকের পর্যবেক্ষণ:

> এদিকে বাংলাদেশের প্রভু নতুন শাসকদের দল ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে পৃথিবীর পথে বেরিয়ে পড়েছেন। জাতীয় উন্নয়ন বাজেটের নব্বই ভাগ সাম্রাজ্যবাদের অর্থ-সাহায্য নির্ভর; বহুজাতিক পুঁজির জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের দরজা। মুষ্টিমেয় কোটিপতিদের স্বার্থবাহী এই রাষ্ট্রযন্ত্র সামান্য মূল্যে সাম্রাজ্যবাদের কাছে ইজারা দিয়েছে দেশকে।[১১]

এই সময় সাম্রাজ্যবাদ নিজ স্বার্থের সাথে যুতসই একটা শাসনব্যবস্থা দাঁড় করালো। হাসান আজিজুল হকের কথায়, "বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্র চলছে, না সেনাবাহিনীর শাসন চলছে সেটার চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে আজকের এই অন্তঃসারশূন্য, শোষণ-জর্জর বাংলাদেশের বর্তমান সমাজব্যবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য শক্ত পাহারাদার হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে স্বৈরতন্ত্র।"[১২]

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের পদ সরকারিকরণ করেন। তার ফলে বিদ্যালয়ের ব্যয় ও শিক্ষকদের বেতন-ভাতার দায় রাষ্ট্র গ্রহণ করে। ফলে ইতিহাসে এই প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা স্বচ্ছলতার আলো-বাতাস পায়। "কিন্তু জিয়াউর রহমান সরকার ১৯৮০ সালে প্রদত্ত এক ঘোষণায় প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকুরি পৌরসভা ও স্থানীয় সংস্থার হাতে ন্যস্ত করেন।"[১৩] এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, রাষ্ট্র প্রাথমিক শিক্ষার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।[*১৪] জেনারেল জিয়াউর রহমান শিক্ষা বিষয়ে ব্রিটিশ-পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক ধারাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলো। ধনিক শ্রেণি ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষাই এই নীতির প্রধান লক্ষ্য।

> ফলে ধনিকের সন্তানদের জন্য ক্যাডেট কলেজ ও রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি দেশে গড়ে উঠতে থাকে পাশ্চাত্য ধাচের কিণ্ডার গার্টেন আর এ-ও লেভেল স্কুল। ...সেই সাথে তীব্রতর বৈষম্য দেখা দেয় সাধারণ মানুষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে উচ্চবিত্তের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। ব্যাপক মানুষের শিক্ষা অবহেলিতই রয়ে যায়।[১৫]

স্বাধীন বাংলাদেশে জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষাদর্শনের যে বিষবৃক্ষ রোপন করলেন জেনারেল এরশাদ তাকে পরিচর্যা করে মহীরুহ রূপে দাঁড় করালেন। জেনারেল এরশাদ দু'টি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। দু'টি কমিশনের রিপোর্টের সারমর্ম প্রায় একই রকম। ১৯৮২ সালে গঠিত হয় ড.

আব্দুল মজিদ খান কমিশন। মজিদ খান শিক্ষার বিভিন্ন স্তরকে এমনভাবে পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করেন যে, বিত্তবানদের সন্তানরা ছাড়া সাধারণ মানুষের সন্তানরা শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারবে না, আগেই ঝরে পড়তে বাধ্য হবে। "ড. মজিদ খান উপস্থাপিত শিক্ষা পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে শিক্ষা যে আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ত....।"[১৬] ছাত্র সমাজ বুকের রক্ত দিয়ে মজিদ খানের শিক্ষানীতি বাতিল করতে সরকারকে বাধ্য করল। অতঃপর জেনারেল এরশাদ ১৯৮৭ সালে ড. মফিজ উদ্দিনের নেতৃত্বে আরেকটি কমিশন গঠন করেন। মফিজ কমিশনের সুপারিশ আরও ভয়াবহ। এই শিক্ষানীতি স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থি। মফিজ কমিশনের সুপারিশ বিশ্লেষণে যা পাওয়া যায় তা এই রকম: "শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্ব সংকুচিত করা, বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা,*[১৭] শিক্ষা প্রসারের রাশ টেনে ধরা, গ্রামে উচ্চ শিক্ষার হার নিম্নগামী করা...।"[১৮]এরপর ২০০৩ সালে খালেদা জিয়া সরকার প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়ার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন অনেক সুপারিশ করেছিল। যেসব সুপারিশ করেছিল তাতে অনেক নির্দেশনা ও কথা ছিল। মনিরুজ্জামান কমিশন রাখ-ঢাক না করেই সরাসরি বলেছিলেন বিদ্যমান শিক্ষা কাঠামো বজায় রাখতে হবে। ঐ কমিশনের যত সুপারিশ ছিল তার মধ্যে সরকার বাস্তবায়ন করেছিল মাত্র দু'টি। এক, সরকারি অর্থায়নে কৃষি, প্রকৌশল ও চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান করা যাবে না। বরং উচ্চ শিক্ষা ব্যক্তিমালিকানায় বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিতে হবে। দুই, মাদ্রাসা শিক্ষা জোরদার করতে হবে। বলাই বাহুল্য উচ্চশিক্ষা শুধুমাত্র শহরের বিত্তবানদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা করা হলো। কাজেই এই শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

তাহলে দরিদ্র সাধারণ মানুষের সন্তানদের শিক্ষার কীহবে? সে ব্যবস্থা জেনারেল জিয়াউর রহমান আগেই করে রেখেছিলেন। "...সমাজে যেহেতু আলাদা আলাদা শ্রেণি আছে, তাদের শ্রেণি স্বার্থগুলি যেহেতু আলাদা, তাই আলাদা আলাদা শিক্ষা চালু আছে। গরিবদের জন্যে রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জন্য সাধারণ শিক্ষা আর ধনীদের জন্যে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা"[১৯] আসলে, "এই পার্থক্য থাকার কারণ বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাটাই শ্রেণিপার্থক্য ও শ্রেণিবৈষম্যের ভিত্তিতে গঠিত।"[২০] এই ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসনামলে ছিল, পাকিস্তানে তা আরো প্রসারিত হলো এবং স্বাধীন বাংলাদেশে জেনারেল জিয়া ঐ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা পাকাপোক্ত করলেন।

২০০৮ সালে বাংলাদেশে একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতাসীন হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল যাকে মানুষ প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী শক্তি হিসেবেই জানে। সরকার ২০০৯ সালে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে চেয়ারম্যান এবং ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদকে কো-চেয়ারম্যান করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। কমিশন ২০১০ সালে রিপোর্ট প্রদান করে, যার নাম দেয়া হয়েছে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০'। এই শিক্ষানীতি আদর্শগতভাবে সমর্থনযোগ্য। মৌলিক প্রগতিশীল শিক্ষাদর্শনের নির্দেশনা ও উপাদান আছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ। "বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।"[২১] ২০০৮ পরবর্তী সরকার বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলায় সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেশ কয়েকটি, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক গুণ। তারপরও শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করা হচ্ছে। তত্ত্ব ও আদর্শের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির ব্যবধান স্পষ্ট। দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান ও নারী শিক্ষা অবৈতনিক করার সরকারি পদক্ষেপ শুধু প্রশংসনীয় তাই নয়, এমন শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচি অতীতে কল্পনাও করা যেত না। একজন ছাত্রীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন দিতে হয় না এটা

যেমন সত্য, তেমনি ঐ ছাত্রীকে মোটা অংকের টাকা হাতে নিয়ে একাধিক কোচিং সেন্টারে যেতে হয় এটাও সত্যি। সমাজের ভেতরে ধনিক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এমনভাবে জেকে বসেছে যে অনেকের সৎ ইচ্ছা হালে পানি পাচ্ছে না।

ইদানীং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাংক বিভিন্ন রকম প্রজেক্ট গ্রহণ করেছে এবং সেখানে অর্থ ঋণ দিচ্ছে। শিক্ষার মানের যে কিছু হচ্ছে ব্যতিক্রম ছাড়া তার প্রমাণ নেই। বাংলাদেশের ঋণের খাতায় টাকার অংক লিখে দিয়ে প্রাপ্ত টাকার একটা অংশ নানা কৌশলে বিশ্বব্যাংক ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাস্তবতা এই যে, বাংলাদেশের শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা আজ ধনিক শ্রেণি ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করেছে। "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাঙলাদেশে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এর মাধ্যমে ও দ্বিপাক্ষিকভাবে অর্থনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে।"[২২] এসব সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে হলে শুধুমাত্র নির্বাচিত সরকারই যথেষ্ট নয়, দরকার সামাজিক রূপান্তরের মাধ্যমে কিছু মৌলিক পরিবর্তন।

৩.২ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষক

১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হয়ে যারা এ দেশে এসেছিল তারা একটি পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক ছিল। তারা ছিল নব বিকশিত একটি পুঁজিবাদী দেশের মানুষ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি। তখন তাদের দেশে উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রসারিত হয়েছিল। ইতিহাসে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধ বিলুপ্তির পেছনে পুঁজিবাদের একটি প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল ও আছে। তবে ভারতবর্ষে তেমনটা হয়নি এবং বিস্ময়ের ব্যাপার কোম্পানি ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ১৭৮০ সালে ক্যালকাটা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে।[২৩] অথচ ইংরেজরা ধর্ম বিশ্বাসে ছিল খৃষ্টান, মুসলমান নয়। তাহলে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কি মুসলমান বা ইসলাম ধর্মের প্রতি দরদবশতঃ করেছিল। এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কোম্পানির শাসন বা রাণীর শাসন উভয় ক্ষেত্রে একটি নীতি অভিন্ন ছিল– এদেশের মানুষকে মন-মানসিকতায়, চেতনায়, মূল্যবোধে, অর্থনৈতিক জীবনে বহুভাগে বিভক্ত করে ঔপনিবেশিক শাসন স্থায়ী ও পোক্ত করা। এই বিভক্তি করণে তারা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে ধর্ম ও শিক্ষাকে। তারা এদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে সীমিত পরিসরে কিন্তু অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় নি। তারা চায় নি যে, শিক্ষার মাধ্যমে উদার গণতান্ত্রিক, মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হোক এবং বিস্তার লাভ করুক। তারা আলোকিত মানুষ চায়নি, চেয়েছে অনুগত মানুষ। তারপরও আমরা এই দেশে রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য, কাজী আব্দুল ওয়াদুদের মতো অনেক আলোকিত, উদার, মানবিক গুণসম্পন্ন সৃষ্টিশীল মানুষের পরিচয় পাই। শিক্ষাব্যবস্থা এদের সৃষ্টি করেনি, এঁরা স্বচেষ্টায় স্বশিক্ষিত মানুষ। ব্রিটিশের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামন্ততান্ত্রিক সংকীর্ণ মূল্যবোধের মধ্যে আটকে রাখা এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজন বিকশিত করা। তারা তিন প্রকৃতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললো- সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসাও টোল।

১৭৮০ সালে ক্যালকাটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার বহু বছর পর ক্যালাকাটা মাদ্রসায় ইংরেজি কোর্স চালু করা হয়। পরবর্তীকালে ঢাকাসহ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শহরে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'নিউ মাদ্রাসা' নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানে মুসলিম সমাজের মধ্যবিত্তের সন্তানরা লেখাপড়ার সুযোগ পায়। সাম্প্রদায়িকতা বিকাশে এইসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কম নয়। "বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কারণে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিভুক্ত হিন্দু-মুসলমানদের সামাজিক জীবনের মধ্যে অল্প বিস্তর পার্থক্য বরাবরই থেকেছে। কিন্তু সে পার্থক্যগুলি

মোটেই মৌলিক নয় এবং সেগুলির কারণেই মূলতঃ হিন্দু-মুসলমান বিভেদের উৎপত্তি হয়নি।"[২৪] অর্থনৈতিক শ্রেণি পার্থক্যই মৌলিক পার্থক্য। আর এই মৌলিক পার্থক্য চাপা দেবার জন্য ধর্মগত অমৌলিক পার্থক্য শোষক শ্রেণি উস্কে দেয়। বদরুদ্দীন উমরের ইতিহাস চর্চা বস্তুনিষ্ঠ ও প্রামাণ্য। "... ভারতীয় ধনতন্ত্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রসার ও অগ্রগতির সাথে ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনক্ষেত্রে সৃষ্টি করলো এক কুৎসিত জটিলতা। এ জটিলতার নামই সাম্প্রদায়িকতা।"[২৫] এই কুৎসিত জটিলতা আপনাআপনি সৃষ্টি হয়নি। স্বার্থকেন্দ্রিক সংঘাতই এর মূল কারণ।

সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ভেদনীতি শিক্ষা ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা হলো এবং শিক্ষাব্যবস্থা সাম্প্রদায়িকতার কালিমায় কলুষিত হলো। "যাতে সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠতে পারে , তার জন্য সরকার মিউনিসিপ্যাল কমিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং সম্প্রদায়গত স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে শিক্ষার বিকাশকে সযত্নে নিয়ন্ত্রণ করত।"[২৬] ইতিহাসের পাতা থেকে বদরুদ্দীন উমর বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন:

> ১৮৮২ সালের তেসরা ফেব্রুয়ারি লর্ড রিপন সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার আনুপূর্বিক তদন্তের জন্যে হান্টারের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করেন। নবাব আবদুল লফিতকে কমিশন তাঁদের সামনে সাক্ষাৎদানের জন্যে আহ্বান করে তাঁকে চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেন। এই প্রশ্নগুলির মধ্যে চতুর্থটি ছিল কোন ভাষায় বাংলা ও বিহারের মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়া হবে সেই সম্পর্কে। প্রশ্নটির জবাবে বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি লিখিতভাবে বলেন যে, নিম্ন শ্রেণির মুসলমান, যারা জাতিগতভাবে হিন্দুদের থেকে পৃথক নয়, তাদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে, বাংলায় শিক্ষা দেওয়া চলতে পারে। তবে সে বাংলা অবশ্য হিন্দুদের দ্বারা ব্যবহৃত এবং সংস্কৃত প্রভাবিত বাংলা নয়। সে বাংলাকে মুসলমানদের (অর্থাৎ উচ্চবিত্ত মুসলমানদের) মধ্যে প্রচলিত অসংখ্য আরবী-ফারসি-উর্দু শব্দ দ্বারা পরিশুদ্ধ করা প্রয়োজন।[২৭]

নবাব আবদুল লতিফের বক্তব্য যেমন সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রকাশ করে, তেমনি সাম্প্রদায়িক এবং তা একই সাথে তার শ্রেণি চরিত্রের পরিচায়ক। সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার নীতি বাস্তবায়নে উচ্চবিত্ত মুসলমানরা ছিল ব্রিটিশ রাজের সহযোগী এবং মধ্যবিত্তের একাংশ ছিল এর প্রচারক।

ইংরেজদের উস্কে দেওয়া সাম্প্রদায়িকতা পাকিস্তান আমল শুরু হওয়ার আগেই পুষ্ট হয়ে জন্ম হয়েছিল দ্বি-জাতি তত্ত্বের। দ্বি-জাতি তত্ত্বে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়কে দাবি করা হলো জাতি বলে। কাজেই সাম্প্রদায়িকতা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের প্রাণভোমরায় পরিণত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতার আসনে বসলো অবাঙালি উর্দুভাষী পাঞ্জাবি উচ্চবিত্ত এলিট নেতারা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই রাষ্ট্রের শাসকরা ঘোষণা করলো উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা অথচ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা ছিল বাংলা। ঘোষণার সাথে সাথে পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে গর্জে উঠলো।[২৮] এসব প্রতিবাদ ও আন্দোলনের চাপে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিল। এই স্বীকৃতি ছিল উপরে উপরে। তারা ভেতরে ভেতরে এমন শিক্ষানীতি গ্রহণ করল যা হান্টার কমিশনের সামনে নবাব আব্দুল লতিফের দেয়া সাক্ষ্যের চেয়ে জঘন্য। এ প্রসঙ্গে উমরের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষানীতি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চাকে আজ এক শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছে। ... বলা হচ্ছে যে পাকিস্তান ইসলামি রাষ্ট্র, কাজেই এদেশের সব কিছুই হতে হবে ধর্মভিত্তিক অর্থাৎ আসলে সাম্প্রদায়িক। এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে চেষ্টা হয় এক ভাষাকে হিন্দু এবং অন্যভাষাকে মুসলমান আখ্যা দেওয়ার। এর ফলেই হিন্দু সাহিত্যিকদের লেখাকে বিধর্মী জ্ঞানে অবজ্ঞা এবং বর্জন করার নীতির দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরে শিক্ষানীতি হয় বিশেষভাবে চিহ্নিত।[২৯]

পাকিস্তান সরকারের সাথে সম্পর্কিত তথাকথিত শিক্ষিত ক্ষমতাশ্রয়ী মধ্যবিত্তের একাংশ বঙ্কিম, রবীন্দ্র বিরোধী একটা আন্দোলন গড়ে তুললো। উমর বলেন:

> পূর্বপাকিস্তানের সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা এবং রক্ষা করার স্বর্গীয় দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের মতে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু' এবং 'ভারতীয়'; কাজেই রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলে অথবা রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্যের চর্চা করলে এদেশের 'তৌহিদবাদী' মুসলমানদের দুনিয়া এবং আখেরাত দুইই বরবাদ হবে।[৩০]

শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, একইভাবে বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অক্ষয় কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্তভট্টাচার্য পাঠ্যপুস্তকে হলেন অবহেলিত। অপরপক্ষে পাকিস্তান রাষ্ট্রে নজরুল চর্চায় বিকৃতি ও প্রচারে অসততা রুচির সীমা ছাড়িয়ে যায়। আসলে কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যিক সত্তার স্বরূপ কী?

> বাঙালি হিসাবে তাই তাঁর ধর্ম ছিল না, থাকলে ততখানি পুরোপুরিভাবে বাঙ্গালি হতে সক্ষম হতেন না। ...অর্থাৎ তিনি শুধু হিন্দু অথবা শুধু মুসলমান নন- তাঁর মধ্যে এ দুইয়ের অবাধ সমন্বয়। এই সমন্বয়ের মধ্যেই নজরুলের বৈশিষ্ট্য, এর মধ্যেই তাঁর বাঙালীত্বের সম্পূর্ণতা। এজন্যেই তিনি অবিভাজ্য।[৩১]

যে নজরুল মানসিকতায়, ভাবাদর্শে, সমাজ-চেতনায় ছিলেন সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, সেই নজরুলকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হলো একজন সাম্প্রদায়িক মানুষ হিসেবে। রেডিওতে তাঁর কতকগুলি ধরাবাধা গান ব্যতীত অন্য কোনো গান দেওয়া হয় না। এমনকি অনেক সময় তাঁর গানের শব্দ পরিবর্তন করে গাওয়া হয়। শুধু গান কেন, তাঁর অসংখ্য কবিতার বিভিন্ন লাইনে বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তকের জন্য নির্বাচিত কবিতার শব্দ পরিবর্তন করা হয়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন। মূল রচনা–

"নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশশ্মান"[৩২]

পাকিস্তানি সংস্করণ হলো–

"নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব গোরস্থান।"[৩৩]

পূর্ব পাকিস্তানের নজরুল চর্চার প্রকৃতি ও পাঠ্যপুস্তকে নজরুলের রচনা নির্বাচন ও নজরুলের মূল রচনা পরিবর্তন করে প্রকাশ করা প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমরের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত সঠিক ও যুক্তিযুক্ত।

> সম্প্রতি একটি বিশেষ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রে 'সুধীবৃন্দের' দরিরামপুর সাহিত্য সমাবেশের সম্পর্কে কয়েকদিন ধরে বিস্তৃত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এগুলি থেকে মনে হয় ইসলাম বিষয়ক ব্যতীত অন্য কিছু সম্পর্কে নজরুল কোন দিন কিছু লেখেননি, 'মুসলিম রেনেসাঁ'সই ছিলো তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র এবং তাঁর মতো ধার্মিক মুসলমান তৎকালীন বাঙলাদেশে প্রায় ছিলো না বললেই চলে। সংবাদপত্রটি পরিবেশিত এই বিবরণ যদি অতিরঞ্জিত না হয় তাহলে দেখা যাবে যে, উপরোল্লিখিত সাহিত্য সমাবেশে 'সুধীজনেরা', আমাদের দেশের চলিত ভাষায়, নজরুল ইসলামের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলেছেন। [৩৪]

পাকিস্তান সরকারের এই দর্শন প্রতিফলিত হয় শরীফ কমিশনের রিপোর্টে। শরীফ কমিশন যে সুপারিশ করে সেগুলির মধ্যে ভাষা সক্রান্ত সুপারিশ এই রকম : "উর্দুকে মুষ্টিমেয় লোকের পরিবর্তে জনগণের ভাষায় পরিণত করিতে হইবে।"(প্রতিবেদনের পৃ.৫১৯)[৩৫]

শরীফ কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে ছাত্র আন্দোলনের চাপে পাকিস্তান সরকার ১৯৬২ সালে শরীফ কমিশনের প্রতিবেদন ও সুপারিশ স্থগিত করে এবং ১৯৬৪ সালে বিচারপতি হামুদুর রহমানকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। হামুদুর রহমান কমিশনের প্রতিবেদনে শিক্ষা সম্পর্কে প্রায় কিছুই ছিলো না, ছিলো ১৯৬২ তে যেসব ছাত্র সংগঠন শরীফ কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদে আন্দোলন করেছিলো তাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার।

পরবর্তীকালে ১৯৬৯ সালে সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান এয়ার মার্শাল নূর খানকে পাকিস্তানের জন্য নয়া শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব দেন। নূর খান ঐ বছর জুলাই মাসে 'নয়া শিক্ষানীতির জন্য প্রস্তাব' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। "...এই প্রস্তাব শরীফ কমিশন কিংবা হামুদুর রহমানের প্রস্তাবের প্রতিধ্বনি মাত্র। এরা সকলেই সাম্প্রদায়িক ভাবধারায় জাতীয় বিকাশবিরোধী পথে ধনবাদী ধারায় শিক্ষাকে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন।"[৩৬] নূর খানের প্রস্তাবে শিক্ষার চেয়ে জাতীয় ঐক্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বক্তব্যের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। "জাতীয় ঐক্য অর্থ যে বাঙালিসহ বিভিন্ন জাতির জাতিসত্তা বিসর্জন দিয়ে 'পাকিস্তানি জাতিসত্তা' নামক ভ্রান্ত দ্বি-জাতিতত্ত্বকে সমৃদ্ধ করা এবং সাম্প্রদায়িকতাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা তা অবশ্য বলাই বাহুল্য।"[৩৭]

এ ধরনের সাম্প্রদায়িক শিক্ষাদর্শনের কারণে আলিয়া, কওমি ইত্যাদি নানা ধরনের মাদ্রাসার সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগলো। মাদ্রাসাগুলি সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও সাম্প্রদায়িকতার চর্চা ও প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হলো। মাদ্রাসাশক্তি যোগালো সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে। তাই বদরুদ্দীন উমরের সিদ্ধান্ত, "পাকিস্তান আদর্শবাদী এবং ইসলামি রাষ্ট্র এই অজুহাতে ইচ্ছাকৃতভাবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে, বিশেষত নিম্ন পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে।"[৩৮] কাজেই পাকিস্তানের শিক্ষানীতি সামন্ততান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল তো বটেই, উপরন্তু তা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের একটি অংশ।

প্রত্যক্ষ সমর যুদ্ধে জয়ী হয়ে বাঙালি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জন্ম দিল 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করলেন। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও খুদা কমিশন মোটামুটি গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিলেন। "(ঘ) ধর্মনিরপেক্ষতা: রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি ধর্মনির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করেছে। এই নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সুসমন্বিত মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ও গুণাবলী বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।"[৩৯] এই শিক্ষানীতির আলোকে পাঠ্যপুস্তক রচিত হলো, পঠন-পাঠনও শুরু হলো। এক বছর যেতে না যেতেই বঙ্গবন্ধু হত্যার মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তন হলো। রক্তাক্ত প্রতি বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। অঘোষিতভাবে পরিত্যক্ত হলো খুদা কমিশনের শিক্ষানীতি। সামরিক সরকার বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক পরিচয়ও বদলে দিল। স্পষ্ট করে প্রচার করা হলো এদেশের মানুষের সংস্কৃতি বাঙালি সংস্কৃতি নয়, এদেশের মানুষের সংস্কৃতির নাম 'বাংলাদেশী সংস্কৃতি', বাংলাদেশী সংস্কৃতি বস্তুটা কী ? "...একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে, এই বাংলাদেশী জাতীয়তার ভিত্তি মূলত সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়।"[৪০] অর্থাৎ বাংলাদেশ হলো নয়া পাকিস্তান। এই নীতি অনুসারে পূর্বের পাঠ্যপুস্তক পরিত্যক্ত হলো এবং সম্প্রদায়িক নীতি অনুযায়ী নতুন পাঠ্যপুস্তক রচিত হলো। পাঠ্যপুস্তকের নবতর সংস্করণে জঘন্যভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণির একটি গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি লাইন বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই পাঁচটি লাইন হলো-

> মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এদেশীয় কিছু লোক পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। এমনকি তারা অনেক নিরীহ বাঙালিকে নির্যাতন ও হত্যা করে। পাকিস্তানিদের এই দোসররা রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস ইত্যাদি নামে পরিচিত। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পূর্বক্ষণে তারা এদেশের খ্যাতিমান শিক্ষক, ডাক্তার, শিল্পী ও সাংবাদিকসহ বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের স্মরণে ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়।[৪১]

মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা এবং যেসব সংগঠন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল, তারা জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সমর্থন করায় পাঠ্যপুস্তকে তাদের নাম ধামাচাপা দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন পাকিস্তানপন্থি। ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য রচিত বাংলা সাহিত্যের সংকলন 'চারুপাঠ'। 'চারুপাঠ' সংকলন থেকে একটি গল্প বাদ দেয়া হয়েছে।

> সম্পাদক মাহবুবুল হক যাঁর 'গদ্য' বাদ দিয়েছেন, তিনি অতি শ্রদ্ধেয়, পরলোকগত রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭)। তাঁর 'গদ্য' টি একটি গল্প, নাম 'মাল্যদান', মুক্তিযুদ্ধের পরপর লেখা, অসাধারণ ব্যঞ্জনাময়। কিন্তু, এই পরিবর্তন কেন করলেন ড: হক? হয়ত এর একটি কারণ, রণেশ দাশগুপ্ত হিন্দু।[৪২]

এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেয়া যাবে যে, কতটা ইতিহাস বিকৃতি ও কতটা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পচাঁত্তর পরবর্তী পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছিল।

১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদের মন্ত্রীপরিষদ শিক্ষা বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে তাতে, "প্রথম শ্রেণি থেকে আরবী ও দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে ইংরেজি শিক্ষার কথা বলা হয়। সব মিলিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই একজন শিশুকে মাতৃভাষাসহ তিনটি ভাষা শিখতে হবে।"[৪৩] এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শিক্ষাবিদসহ সারাদেশের সুধীজনেরা প্রতিবাদের ঝড় তোলেন।

এরশাদ সরকারের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব ও এরশাদ গঠিত ড. মজিদ খান কমিশনের সুপারিশ ছাত্ররা বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিহত করে। অতঃপর জেনারেল এরশাদ ১৯৮৭ সালে ড. মফিজউদ্দিনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। মফিজ কমিশনের সুপাশিগুলির মধ্যে একটি প্রধান সুপারিশ ছিল, "শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত বিভক্তি জোরদার করা।"[৪৪] বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষ সরকারিভাবে ছড়ানো হয়েছে যা হতাশাজনক ও উদ্বেগজনক। "এ শিক্ষাব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত।"[৪৫]

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর পেছনে প্রগতিশীল চিন্তা কাজ করেছে, ভালো ভালো কিছু নির্দেশনাও আছে। কিন্তু কতটা প্রয়োগ করা গেছে বা প্রয়োগ করা যাচ্ছে সে বিষয়ে শিক্ষাবিদগণ প্রশ্ন তুলছেন। বাংলাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার সংখ্যা সমান সমান। তথ্য অনুসারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার এবং মাদ্রাসার সংখ্যাও প্রায় তাই। এই মাদ্রাসাগুলো সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষকতা করে। এ প্রসঙ্গে উমরের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

> এই মাদ্রাসাগুলো এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির ঘাঁটি। এগুলোকে কেন্দ্র করেই ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা এখন বাঙালাদেশের প্রগতিশীল বিকাশের জন্য হয়েছে হুমকিস্বরূপ। এই পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে কওমি মাদ্রাসাগুলোর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে। এই মাদ্রাসাগুলোর ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।[৪৬]

অনেক মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয় না, জাতীয় সংগীতও গীত হয় না। তাছাড়া অনেক মাদ্রাসায় জঙ্গিবাদ চর্চা ও জঙ্গিবাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এমন অভিযোগ আছে।

তবে একথা সত্য যে, ২০১০ পরবর্তী সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে না। বরং সাধ্যমতো নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সাধ্যের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট। কাজেই একথা দাবি করা যাবে না যে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িকতামুক্ত। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় শুধু সরকারি উদ্যোগই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক জাগরণ।

৩.৩ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় ঐক্যবোধের চেতনা সৃষ্টির অন্তরায়

বাঙালি জাতি অবিভাজ্য। এই অবিভাজ্য জাতিকে শিক্ষার মাধ্যমে বিভক্ত করা হয়েছে এবং হচ্ছে। পৃথিবীর তাবৎ দেশে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে শিশুদের একটি অভিন্ন পাঠ্যক্রমে পাঠদান করা হয়। ফলে শিশুরা একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এবং একটি ঐক্য চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে বেড়ে ওঠে। এদেশে প্রথম ব্রিটিশরা হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক শিক্ষা চালু করেছিল। ওটা ছিল প্রত্যক্ষ বিভক্তি। পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে পরোক্ষভাবে জাতিকে বহুভাগে ভাগ করা হচ্ছে যা আরও ভয়ানক। প্রাথমিক স্তর থেকে চালু আছে: সাধারণ শিক্ষা, ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা।

> বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলিতে তবুও মুক্তিযুদ্ধ বা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিষয়টি আছে। ইংরেজি বইতে তা সম্পূর্ণ ভাবে অনুপস্থিত। একই দেশে দু'ধরনের মানসিকতার ছেলে মেয়ে গড়ে উঠছে। ইংরেজি মাধ্যমে মার্কোপোলো থেকে যিশুখৃষ্ট, গান্ধী পর্যন্ত অনেকের অনেক কিছু জানা যাবে, জানা যাবে না বঙ্গবন্ধু বা বাংলাদেশের সম্পর্কে।[৪৭]

আবার মাদ্রাসায় যে সব শিশু পড়ে তারা গড়ে ওঠে ভিন্ন মানসিকতায়। "যখনই বিভিন্ন ধারার শিক্ষার কথা আসে, তখন সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার কথা আসে। ...। আমরা বারবার বলে আসছি, শিক্ষার মধ্যে একমুখিনতা, সাধারণ ঐক্য দরকার, যা হবে সবার জন্য বাধ্যতামূলক। জনগণের মধ্যে অখণ্ড সংস্কৃতি নির্মাণের জন্যেই এটা দরকার।"[৪৮] বহুধারার শিক্ষা বহুধারার সংস্কৃতি সৃষ্টি করছে। এর সামাজিক অভিঘাত ভয়ানক।

> এ দেশের সাংস্কৃতিক জীবনও আজ পঙ্গুদশাপ্রাপ্ত। যে কোন দেশের অথবা দেশের অংশবিশেষের সাংস্কৃতিক বিপর্যয় এবং পঙ্গুত্ব তার সামগ্রিক জীবনকে আচ্ছন্ন করতে বাধ্য। তার দেশপ্রেম, আত্মসম্মানবোধ এবং গৌরব চেতনা সব কিছুই তার সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে অবিচ্ছিন্ন। এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে পঙ্গু ও বিধ্বস্ত করতে সমর্থ হলে পরোক্ষভাবে সে সমাজের সামগ্রিক জীবনকে পঙ্গু ও বিধ্বস্ত করার কাজ অনেকখানি সফল ও দ্রুততর হয়।[৪৯]

জাতীয় অনৈক্যের কারণে বিভিন্ন ধারার মানসিকতার মানুষের মধ্যে সম্পর্ক সংঘাত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কাজেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা শুধু জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিতে অক্ষম তাই নয়, উপরন্তু তা জাতীয় অনৈক্য সৃষ্টির সহায়ক। আজ জাতীয় ঐক্যের সংকট প্রকট। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকলে এই ঐক্যের সংকট ভবিষ্যতে আরও গভীরতর হবে। কাজেই আমাদেরকে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

৪. উপসংহার

পরিশেষে এ কথা স্পষ্টভাবেই বলা যায় যে, শিক্ষা সমাজ পরিবর্তনের সব থেকে বড় অস্ত্র বা হাতিয়ার হলেও এই হাতিয়ারকে শাসকগোষ্ঠী যুগে যুগে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বৃহত্তর জনসাধারণকে শাসন ও শোষণ করার কাজে ব্যবহার করেছেন। তারা নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থাকে সাজিয়ে নিয়েছেন। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলের এবং বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী ঐ একই উদ্দেশ্যে শিক্ষাকে ব্যবহার করেছেন। অপরদিকে যারা সমাজ থেকে শ্রেণিবৈষম্যকে দূর করে মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চান তাঁরাও শিক্ষাকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। বদরুদ্দীন উমর এই দ্বিতীয় ধারার একজন অন্যতম শিক্ষাদার্শনিক।

কারণ তিনি মনে করেন ব্যাপক জনগণের মধ্যে সত্যিকার শিক্ষা বিস্তার ঘটলে শাসক শ্রেণির শোষণ আর চলবে না। ফলে সমাজে আমূল পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। তাই শাসক শ্রেণি চিরকালই প্রকৃত ও মানসম্মত শিক্ষাকে গণমুখী না করে মুষ্টিমেয়ের ঘরে আবদ্ধ রেখেছে। শিক্ষাকে তারা বহুধারায় বিভক্ত করেছে, একদিকে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা অপরদিকে পশ্চাৎপদ মাদ্রাসা শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে শিক্ষাকে শ্রেণিবিভক্ত ও বৈষম্যমূলক করেছেন। তাই শ্রেণিবিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই শিক্ষা ক্ষেত্রে শ্রেণিবৈষম্য দূর করে তাকে গণমুখী ও জনকল্যাণকর করা সম্ভব। আর এ জন্য বাংলাদেশের শিক্ষা আন্দোলনকে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে একসঙ্গে পরিচালিত করা প্রয়োজন– উমরের এই মতকে অস্বীকার করা যায় না। তবে সমাজ পরিবর্তনে বিলম্ব হলে বাংলাদেশের শিক্ষানীতিকে একমুখী, বৈষম্যহীন এবং আরো বিজ্ঞাননিষ্ঠ করে এটাকে দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়নে উদ্যোগী হলে আমরা কিছুটা হলেও শ্রেণিহীন, বৈষম্যহীন ও জনকল্যাণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা পেতে পারি।

টিকা ও তথ্যনির্দেশ

---

[১] বদরুদ্দীন উমর, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ*, অন্তর্ভুক্ত, *বদরুদ্দীন উমর রচনা সংগ্রহ-২*, মু. সাইফুল ইসলাম (সম্পা.), (ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১২), পৃ. ৪৭৪।

[২] বদরুদ্দীন উমর, "প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি দিক", অন্তর্ভুক্ত, *ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৪র্থ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫) , পৃ. ৫৩।

[৩] বদরুদ্দীন উমর, "ভারতবর্ষে ব্রিটিশের ক্ষমতা দখল ও হস্তান্তর", অন্ত. *সাম্প্রদায়িকতা* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ৯ম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৫), পৃ. ৪৪।

[৪] বদরুদ্দীন উমর, "প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি দিক", অন্ত., *ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ৫৩।*

[৫] মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ওয়ার্সী প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮৭) পৃ. ৬৭।

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

[৭] বদরুদ্দীন উমর, "শিক্ষার মাধ্যম" *সংস্কৃতির সংকট*, অন্ত., *বদরুদ্দীন উমরের রচনা সংগ্রহ-১* (মু. সাইফুল ইসলাম সম্পাদিত), (ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, মার্চ ২০১২), পৃ. ১৪৩।

[৮] বদরুদ্দীন উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ৫ম মুদ্রণ, ২০০৩), পৃ. ৯৮।

[৯] *ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট*, মে ১৯৭৪, পৃ. ২৮৪।

[১০] মুনতাসীর মামুন, *পাঠ্যবই: ইতিহাস দখালের ইতিহাস* (ঢাকা: ডানা পাবলিশার্স, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০২), পৃ. ৪৯-৫০।

[১১] হাসান আজিজুল হক, "গণ-প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা", *প্রবন্ধসমগ্র ১* (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১), পৃ. ৪২৬।

[১২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৬।

[১৩] নিতাই দাস, *বাংলাদেশে শিক্ষা আন্দোলন* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯), পৃ. ১৭১।

[১৪*] শিক্ষক-ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে জেনারেল এরশাদ ১৯৮৩ সালে ঐ ঘোষণা প্রত্যাহার করে।

[১৫] নিতাই দাস, *বাংলাদেশে শিক্ষা আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

[১৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১।

[১৭*] উল্লেখ্য বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭৩ সালে তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিয়ে মত প্রকাশ ও রাজনীতি করার অধিকার দিয়ে জাতীয় সংসদে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩ পাশ করেন।

[১৮] নিতাই দাস, *বাংলাদেশে শিক্ষা আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

[১৯] হাসান আজিজুল হক, "শিক্ষার মৃত্যু ঘটেছে, কেবল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াই বাকি", *প্রবন্ধসমগ্র-২* (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১), পৃ. ৩৩৯।

---

[২০] বদরুদ্দীন উমর, "প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন ও শিক্ষাব্যবস্থা", অন্ত., *বাঙলাদেশে শিক্ষা সংস্কৃতি* (ঢাকা: সুবর্ণ, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮), পৃ. ৬৪।

[২১] *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*, "শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য" ধারা-৮, পৃ. ১।

[২২] বদরুদ্দীন উমর, "সাম্রাজ্যবাদের পতনের যুগ শুরু হয়েছে", অন্ত., *সমাজতন্ত্রের অনিবার্য ভবিষ্যৎ* (ঢাকা: বাঙ্গালা গবেষণা, ১ম প্রকাশ, মে ২০১৮), পৃ. ২০০।

[২৩] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ* (ঢাকা: জাগরণী প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃ. ১৯।

[২৪] বদরুদ্দীন উমর, *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িতকা*, মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।

[২৫] বদরুদ্দীন উমর,"সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় রাষ্ট্র" *সাম্প্রদায়িকতা*, অন্ত., *বদরুদ্দীন উমরের রচনা সংগ্রহ-১* (মু. সাইফুল ইসলাম সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

[২৬] বিপান চন্দ্র, *আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ* (কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৯), পৃ. ২৮২।

[২৭] বদরুদ্দীন উমর, "উনিশ শতকে মুসলিম শিক্ষা ও মাতৃভাষা চর্চা" *সংস্কৃতির সংকট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

[২৮] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ৩য় খণ্ড* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২য় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৫), পৃ. ১৯৬।

[২৯] বদরুদ্দীন উমর, "শিক্ষার মাধ্যম", *সংস্কৃতির সংকট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

[৩০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩।

[৩১] বদরুদ্দীন উমর, "নজরুল ইসলাম অহিফেন", *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা*, প্রগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

[৩২] কাজী নজরুল ইসলাম, "চল চল চল", *আমার বাংলা বই*, ৩য় শ্রেণি, (ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, ২০২১), পৃ. ২২।

[৩৩] মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

[৩৪] বদরুদ্দীন উমর, "নজরুল ইসলাম অহিফেন", *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩।

[৩৫] গৃহিত, মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।

[৩৬] নিতাই দাস, *বাংলাদেশে শিক্ষা আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

[৩৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯।

[৩৮] বদরুদ্দীন উমর, "ছাত্র রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন", *সংস্কৃতির সংকট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

[৩৯] *ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট*, মে ১৯৭৪, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী, ধারা ১.২.(ঘ), পৃ. ২।

[৪০] বদরুদ্দীন উমর, "বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি", *যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ* (ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৫) পৃ. ৪৬।

[৪১] মুনতাসীর মামুন, *পাঠ্যবই: ইতিহাস দখলের ইতিহাস* (ঢাকা: ডানা পাবলিশার্স, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০২), পৃ. ৩৭।

[৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

[৪৩] নিতাই দাস, *বাংলাদেশে শিক্ষা আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

[৪৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

[৪৫] শহিদুল ইসলাম, "শিক্ষাদর্শন ও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা", অন্ত., *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ* (ঢাকা: ভূমিকা, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫), পৃ. ২৩।

[৪৬] বদরুদ্দীন উমর, "বাঙলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা", *বাঙলাদেশে শিক্ষা সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

[৪৭] মুনতাসীর মামুন, *পাঠ্যবই: ইতিহাস দখলের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

[৪৮] হাসান আজিজুল হক, "শিক্ষার মৃত্যু ঘটেছে, কেবল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাকি", *প্রবন্ধসমগ্র-২* (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১), পৃ. ৩৩৯।

[৪৯] বদরুদ্দীন উমর, "রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি", *সংস্কৃতির সংকট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৪।